মাধ্যাকর্ষণ

সমীর সেন

চিৎপুর রোড থেকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারির গা ঘেঁষে যে গলিটা বেরিয়ে গিয়েছে, সেই গলিতে ঢুকবার আগে কৌশিক একটু থেমে স্কুলটার দিকে একবার তাকাল। ভাবল এখানে একসময় রবীন্দ্রনাথ পড়তেন বা পড়তে বাধ্য হতেন। রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ার একটা কারণও ছিল। কারণটা হচ্ছে ও এখন রবীন্দ্র সংগীত শুনতে যাচ্ছে করবী বৌদির কাছে। করবীর সঙ্গে ওর কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই , ডাকা বৌদি। তবে আত্মার সম্পর্ক আছে, কারণ ও বেশ ভালো রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারে। সেই গানের টানেই কৌশিক ঢুকে পড়ল গলির ভেতর।

অফিসে বসে কাজ করছিল কৌশিক। কাজ করতে করতে হঠাৎ একবার জানলার দিকে তাকাল নীলিমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল; নীলিমা মানে শীতের আকাশের নীলিমা। বেশ ঝকঝকে ধারালো নীল। কয়েকখণ্ড সাদা মেঘ ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের মন্থরতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটি চিল শীতের বাতাসের হাতে ছেড়ে দিয়েছে নিজেকে। নীলিমার সঙ্গে এই অপার্থিব চোখাচোখিই ওর সর্বনাশ ক'রে ছাড়ল। মনটা কেমন যেন হয়ে গেল ওর। একটা সাপ যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে ছিল ওর সত্তার গভীরে। ঘুম ভেঙে আস্তে আস্তে নড়েচড়ে উঠল। তারপর নিজেকে নিজের কাছ থেকে খুলে নিয়ে ফণা উঁচু ক'রে ছোবল মারল কৌশিককে। ওর রক্তে ঘুরে বেড়াতে লাগল নীল বিষ। এরকম সময়ে ভীষণ দুঃখী আর অসহায় হয়ে যায় কৌশিক, ভীষণ একা হয়ে যায়। শুশ্রূষা খোঁজে ও।

সিট থেকে উঠে পড়ল কৌশিক। বড়োবাবুর টেবিলের কাছে গিয়ে বলল, অমরদা, আমি চলে যাচ্ছি। অমর মাথা নিচু করে কাজ করছিল, ওর দিকে না-তাকিয়েই বলল, যাও। কৌশিকের অফিস আসা-যাওয়ার ব্যাপারে কেউ খুব-একটা মাথা ঘামায় না, গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। সরকারি অফিস বলেই টিকে আছে চাকরি, টিকে থাকবেও। ওর বকেয়া কাজ বড়োবাবুর আর কলিগরাই তুলে দেয়। তুলে দেওয়ার কারণ ওর জনপ্রিয়তা। পঁয়ত্রিশ বছরের আত্মভোলা অবিবাহিত এই যুবকটির স্বভাবটিই এমন যে কেউ ভালো না-বেসে পারে না।

কৌশিক গলির মধ্যে ঢুকে দু'দিকের পুরোনো নোনাধরা বাড়িগুলির শ্যাওলা দু'হাতে সরিয়ে সরিয়ে শীতের মিষ্টি নরম রোদের ভেতর দিয়ে দ্রুত সাঁতরে এগোতে লাগল করবীদের বাড়ির দিকে। ঘড়িতে দেখল দুটো বেজে পাঁচ। আজ সকালেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল কৌশিক একটা কাজে বা অকাজে। ভেবেছিল অফিস ক্যান্টিনে দুপুরের খাওয়া সেরে নেবে। কিন্তু সে-কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে ও বেরিয়ে পড়েছিল অফিস থেকে। এখন খিদের সাপ ওর পেটের ভেতর কুণ্ডলী জেগে উঠছে। ও ভাবল করবীদের ওখানে গিয়েই খাওয়া যাবে।

একসময় করবীদের বাড়ির কলিংবেল টিপল কৌশিক। টিপেই যে ছেড়ে দিল তা-ও নয়, টিপে ধরেই থাকল অন্যমনস্কভাবে। এ রকম হয় ওর মাঝে মাঝে।

কিছুক্ষণ পর বন্ধ দরজার ওপার থেকে করবীর শাশুড়ির গলা শোনা গেল, কে, কৌশিক? ও উত্তর দিল, হ্যাঁ, মাসিমা, দরজা খুলুন। বিনোদিনী দরজা খুলে একগাল হেসে বললেন, বুঝেছি তুমি, না-হলে এতক্ষণ বেল বাজবে কেন, এসো। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে কৌশিক বলল, দুপুরের খাওয়া এখানেই খাব কিন্তু, রান্না চাপান। অন্য কিছুতে চলবে না, ভাতই খাব। বিনোদিনী ওর আগে-আগে সিঁড়ি ভেঙে উঠছিলেন। পেছন ফিরে তাকিয়ে সস্নেহে হেসে বললেন, তোমার মতো নির্লজ্জ, বে-আক্কেলে ছেলে আর দেখি নি। বিয়ের পর মজা বুঝবে। কৌশিক সরল হেসে বলল, মজা আমি

বুঝব না মাসিমা, মজা বুঝবে বৌ। দু'দিন দেখেই বাপের বাড়ি পালাবে। সেজন্যই তো বিয়ে করব না।
দোতলায় উঠে বিনোদিনী বললেন, তুমি করবীর ঘরে গিয়ে বসো, আমি খেতে দিচ্ছি তোমাকে কিছুক্ষণ পরই। শুধু ভাতট া করতে হবে, আর সব তো ও-বেলার রান্না গরম করে দেব। করবী কৌশিকের গলা শুনে ওর ঘরের দরজায় এসে দাঁ ড়িয়েছিল। একটু হেসে বলল, কী ব্যাপার, এই ভরদুপুরে? কৌশিক নির্দ্বিধায় বলল, মনটা হঠাৎ কেমন খারাপ হয়ে গেল, ভাবলাম আপনার গান শুনি, অফিস থেকে চলে এলাম। ভালো করি নি? করবী ঠোঁট টিপে হেসে বলল, আজকের মন-খারাপের কারণটা কী? কৌশিক কী যেন ভাবছিল অন্যমনস্কভাবে। জবাব দিল, নীলিমার দিকে তাকিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। বিনোদিনী প্রায় রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ কথাটা কানে যাওয়ায় একটু উদ্‌বিগ্নমুখে ফিরে এসে কৌশিককে বললেন, বাবা, যে-মেয়ের দিকে তাকালে মন খারাপ হয় তার দিকে তাকাও কেন? এ-সব মেয়ের সঙ্গে মেল ামেশা না-করাই ভালো। মেয়েটি কি অফিসের? করবীও একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল কৌশিকের দিকে। কৌশিক অন্যমনস্ক ভাবেই উত্তর দিল, না, আকাশের। করবী খিলখিল হেসে উঠে বলল, ওঃ, তা-ও ভালো। বিনোদিনী তখনও ব্য াপারটা বুঝতে না-পেরে করবীর দিকে অবাক হয়ে তাকালেন। করবী বলল, মা, উনি আকাশের নীল রঙের কথা বলছেন। বিনোদিনী হেসে বললেন, তা, বাছা, মন খারাপ হলে আকাশের দিকেই তাকাও কেন?
বিনোদিনী রান্নাঘরে চলে যাওয়ার পর করবী কৌশিককে এনে বসাল নিজের ঘরের সোফায়। কৌশিক একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, অ্যাশট্রেটা দিন তো বৌদি। করবী অ্যাশট্রে এনে রাখল ওর পাশে সোফায়। বলল, অত সিগারেট খান কেন? কৌশিক সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, না-খেয়ে পারি না, তাই। এরপর আর কথা চলে না, চুপ করে গেল করবী। কৌশিক হঠাৎ উঠে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে একটা লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিন এনে সোফায় বসে পড়তে লাগল।
কিছুক্ষণ পর বিনোদিনী এসে কৌশিককে ডেকে নিয়ে গেলেন ডাইনিং মে। করবী বসে বসে ভাবতে লাগল এই মানুষটি অ ার কারো মতো নয়। ও কি জানে না সংসার কত জটিল, মানুষের মন জিলিপির মতো পাক খেয়ে খেয়ে জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে ক্রমশ? তাই হয়তো এত সহজ, সরলভাবে মাঝে-মাঝে অসম্ভব সব দাবি ক'রে বসে মানুষের কাছে। এই দৃষ্টিছাড়া ভাবের পাগলটির ব্যাপারে তাই বোধহয় সংশয়ী, হিসেবী মেপে জীবন চালানো সংসারী নিরস্ত হয়ে যায়। খুশি মনেই প্রশ্রয়ের হাসি হাসতে হাসতে পারলে ওর অসম্ভব-অসম্ভব দাবির কাছেও আত্মসমর্পণ করে। ওর থেকে দু'বছরের ছোটো করবী কিছুটা অভিভাবিকার মন নিয়েই যেন কৌশিকের ভবিষ্যৎ ভেবে একটু শঙ্কিত হল, কারণ বার্ধক্য সবার জীবনেই আসে। ও কি কখনো বিয়ে করবে, বা করলেও বৌ কি কাছে থাকতে পারবে বেশিদিন?
কৌশিকের সঙ্গে প্রথম আলাপের কথা মনে পড়ল করবীর। ওর সঙ্গে তখন কোর্টশিপ চলছে। সায়ন ছিল কৌশিকের অফিস কলিগ, সাইড বিজনেসও করত। তারপর একসময় চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি বিজনেসই শু করেছিল। সায়ন করবীর বন্ধু অতসীর মামাতো দাদা। সেই সূত্রেই প্রথম আলাপ। সুদর্শন দিলখোলা, আমুদে, উদারচেতা সায়নকে করবীর ভালো লাগত। এই ভালোলাগাই প্রথমে ভালোবাসা, তারপর বিয়েতে পরিণতি লাভ করে।
চাকরি ছাড়ার পরও কৌশিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল সায়নের। ও একটু বিশেষ স্নেহের চোখে দেখত কৌশিককে। এ-বাড়িতে কৌশিকের অবাধ যাতায়াতও ছিল, যা এখনো অব্যাহত আছে। বিনোদিনী একটু বিশেষ স্নেহের চোখেই দ্য াখেন ওকে, হয়তো কৌশিকের জীবন জানেন বলেই আরো। বারো বছর বয়সেই কৌশিকের মা মারা যান। ওর বাবাও সেই থেকেই সংসারের প্রতি একটু উদাসীন। কৌশিকের মার মৃত্যুর পর ওর বিধবা পিসিই সংসারের সব ভার নিজের হ াতে তুলে নেন। বাড়িতে ওর কাছ থেকেই একটু স্নেহ পায় কৌশিক।
বিয়ের আগে একদিন কৌশিকের সঙ্গে করবীর আলাপ করিয়ে দিয়েছিল সায়ন এসপ্ল্যানেডের একটা রেস্তোরাঁয়। কৌশিকের সারল্য আর অগোছালো স্বভাব সেদিন একটু আকর্ষণ করেছিল করবীকে। অবশ্য এই সারল্যের জন্য একটু ম াশুলও দিতে হয়েছিল সেদিন সায়ন আর করবীর। কারণ রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে সায়ন কৌশিককে বলেছিল, ঠিক অ াছে, কৌশিক, ভাবী বৌদির সঙ্গে তো আলাপ হল, এবার তুমি কোথাও গিয়ে প্রলাপ বকো, আর আমরা যাই একটু গ ার্ডেনে। কৌশিক বলেছিল, কোথায় আর যাব, কোথায় গেলে যে ভালো লাগবে তা-ও তো বুঝতে পারছি না। চলুন অ াপনাদের সঙ্গে ইডেনেই যাই। এরপর একবার দ্রুত চোখাচোখি হয়েছিল সায়ন আর করবীর মধ্যে। সায়ন কৌশিকের কঁ

াধে একটা চাপড় মেরে বলেছিল, চলো তবে আমাদের সঙ্গেই। করবী চুপসে গেলেও কপট উৎসাহের সঙ্গে বলেছিল, তা হলে তো ভালোই হয়, বেশ আড্ডা মারা যাবে তিনজন। কৌশিক তার বিধবংসী সারল্য নিয়ে বলেছিল, চলুন, আমি থ াকলে আপনাদেরও ভালো লাগবে। করবী অবাক হয়ে ভেবেছিল, এ রকম বয়স্ক শিশু ও আর জীবনে কোনো দিন দ্যাখে নি।

কৌশিক খেয়েদেয়ে করবীর ঘরে এসে ঢুকল। শোফায় গিয়ে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, বৌদি একটা মাদুর প াতুন, দু'জনেই মাদুরে বসি, খালি গলায় গান, রবীন্দ্ররসংগীতকে মাদুরে বসানোই ভালো। করবী বলল, আপনি ভীষণ ব ায়নাক্কাবাজ।

এমন সময় বিনোদিনী এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বললেন, বৌমা, তুমি কৌশিককে গান শোনাও, আমি নীচে যাচ্ছি পৌলমীদের ঘরে লুডো খেলতে। ব'লে নিদ্‌বিগ্নচিত্তে নীচে নেমে গেলেন। কৌশিককে পাহারা দেবার মতো চিন্তা কোনো মেয়ের মা বা কোনো বৌমার শাশুড়ির মাথাতেও আসে না।

করবী মাদুর এনে পাতল মেঝেতে, বসল মাদুরের ওপর। কৌশিকও সোফা থেকে নেমে মাদুরে বসল। করবী জিজ্ঞেস করল, কী কী গান গাইব বলুন। কৌশিক একটু ভেবে তিনটি গান ফরমাশ করল। করবী চোখ বন্ধ ক'রে একটু চুপ করে থেকে বেশ দরদ দিয়ে একে একে গাইল গান তিনটি। 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে', 'জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে বন্ধু হে আমার', 'দূরে কোথায় দূরে দূরে'। করবী গান শেষ করে একবার তাকাল কৌশিকের দিকে। দেখল জান ালা দিয়ে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে উদাস হয়ে। হঠাৎ করবীর দিকে তাকিয়ে কৌশিক বলল, আপনার কে ালে মাথা রেখে একটু শোব, বৌদি? করবী একটু অবাক হয়ে কৌশিকের চোখের দিকে তাকাল। দেখল ওর চোখে একটা নিষ্পাপ অসহায় আর্তি ফুটে উঠেছে। করবী রাজি না-হয়ে পারল না। বলল, ঠিক আছে শোও। কৌশিক করবীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে চোখ বন্ধ ক'রে বলল, এবার কিছুক্ষণ ঘুমাই।

করবীর ভেতর থেকে একটা ক্ষীণ বিপদসংকেত ভেসে এল। মুখে বলল, কিন্তু মা ওপরে উঠে এলে কী ভাববেন। কৌশিক চোখ মেলে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, এতে ভাবার কী আছে বৌদি? ঝড়ের ঝাপট খেয়ে কোনো বিপন্ন জাহাজ যদি বন্দরের আশ্রয় পেয়ে নোঙর ফেলে ঘুমিয়ে পড়তে চায়, বন্দর কি তাকে আশ্রয় দেয় না, না কি দিলে কেউ কিছু ভাবে? করবী ভাবল এর আগে ভরদুপুরে আর কোনো দিন কৌশিক আসে নি ওর গান শুনতে, বা ওর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তেও চায় নি। ও যদি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ে ওর কোলে আর বিনোদিনী হঠাৎ ওপরে উঠে এসে দেখে ফ্যালেন সে দৃশ্য, তা হলে কৌশিকের প্রতি যতই স্নেহশীলা হোন-না-কেন, সেটা মেনে নেওয়া ওঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। হয়তো উনি করবীকেই দায়ী করবেন কৌশিককে এতখানি প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য।

করবী আলতোভাবে কৌশিকের কপালে ডান হাতরেখে বলল, কৌশিক, দয়া করে ঘুমাবেন না। কৌশিক চোখ মেলে নরম চোখ করবীর চোখে রেখে বলল, কেন, ঘুমালে কী দোষ বৌদি?

--আপনার মনে হয়তো কোনো দোষ নেই, কিন্তু অন্যের চোখে দোষ থাকতে পারে। সবাই তো আপনার মতো সরল নয়।

---আপনিও না?

---আমিও নই, ভাই। আমিও জটিল, হয়তো পাপীও।

---কিসের পাপ, বৌদি?

---আসলে কী জানেন, আমরা যে-যার খাঁচায় বন্দী ঠিকই, খাঁচার নিরাপত্তাও আমাদের ভালো লাগে, কিন্তু খাঁচার দরজ া খোলা পেলে আকাশে একটু উড়বার সাধও যে না-জাগে তাও তো নয়। আবার খাঁচায় ফিরে ওই ওড়াউড়িটাই হয়তে া পাপ।

----খাঁচার দরজা খোলা না-রাখলেই হয়।

----সেরকম হয়তো কেউ নিজের অজান্তেই খুলে দেয় দরজাটা। তখন পাখির কী অবস্থা হয় তা হয়তো আপনার কল্পন াতেও আসে না। তখন পাখি না খাঁচার, না আকাশের। বড়ো কষ্ট তাতে। দোহাই আপনার, এবার উঠে বসুন।

কৌশিক উঠে বসলে একটু হেসে বলল, আপনি বরং আমার খাটে ঘুমান, আমি মা-র ঘরে শুচ্ছি। বলে আস্তে আস্তে ঘর

ছেড়ে বেরিয়ে গেল করবী।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ করবী এসে ওর ঘরে উঁকি মেরে দেখল কৌশিক নেই। বাথমের কাছে দেখল বাথমের দরজা খোল া, কেউ নেই। সম্ভাব্য সব জায়গাতেই খুঁজে দেখে নিশ্চিত হল কৌশিক চলে গিয়েছে। নিজের ঘরের দরজার সামনে দাঁ ড়িয়ে ও ভাবতে লাগল কৌশিক ওকে না-বলে চলে গেল কেন। অভিমানে, না ওর কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে? প্রথম সম্ভ াবনাটিই ভাবতে ভালো লাগল করবীর। একটু অনুতাপ হল, অনুতাপ থেকে দুঃখ, দুঃখ থেকে আরো একটা অনুভূতি, একটা অস্পষ্ট নিষিদ্ধ অনুভূতি, যেটাকে স্বীকার করে নিতে ভয় পেল করবী।

এমন সময় নীচ থেকে ওপরে উঠে এল বিনোদিনী। করবীকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কৌশিক চলে গিয়েছে? করবী উত্তর দিল, ও তো আমার ঘরে ঘুমাচ্ছিল, আমি ছিলাম আপনার ঘরে। কিছুক্ষণ আগে এসে দেখি ও এ-ঘরে নেই, কোথাও নেই। নীচে আপনাকে বলে যায় নি? বিনোদিনী বললেন, না তো! দ্যাখো ছেলের কাণ্ড। ওকে বিয়ে দিয়ে খাঁচায় ফেলতে না-পারলে তো ওর এই স্বভাব বদলাবে না। করবী একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল, ও কি খাঁচায় থ াকার পাখি? বিনোদিনী হেসে ফেলে বললেন, আরে একবার পুরে ফেললে কিছুদিন পর পোষ মেনে খাঁচা ছেড়ে উড়তে চ াইবে না। করবী নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, আপনার ছেলে খাঁচায় থাকে কতক্ষণ? বিনোদিনী নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন, ওর তো বিজনেস।

এরপর আস্তে আস্তে একটা পরিবর্তন ঘটতে লাগল করবীর মধ্যে। প্রথম প্রথম নিজের কাছ থেকে নিজে পালাতে পারছিল করবী চেষ্টা ক'রে। কখনো কখনো মার্কেটিংয়ে বেরিয়ে যেত বা আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি, ঘরের কাজে বেশি মন দিতে শু করেছিল, সায়নকে কাছে পেলে হালকা আড্ডায় ডুবিয়ে দিতে চাইত নিজেকে, আবার কখনো বা বলে-কয়ে রা জি করিয়ে সায়নকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত কাছে পিঠে কোথাও। আসলে করবী নিজের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু বেশিদিন এভাবে নিজেকে ফাঁকি দিতে পারল না করবী। একসময় সভয়ে অনুভব করল, ওর সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। এর অ াগে পুষ আসে নি ওর জীবনে, তা নয়, মনের ওপরের স্তরকে তারা ছুঁয়ে গিয়েছিল মাত্র। সায়ন পার হতে পেরেছিল কয়েকটি স্তর। কিন্তু এখন যে এসেছে সে স্তরের পর স্তর পার হয়ে একেবারে মর্মমূলে গিয়ে হানা দিয়েছে করবীর, ঘর তছনছ ক'রে। সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছে। অথচ এই দস্যুটির ধরনই আলাদা। ও নিজেই জানে না ও কী করেছে। করবীর বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ও তো আপনমনে উদ্দেশ্যহীন গান গেয়েছিল শুধু, দরজায় হাত পর্যন্ত রাখে নি। অথচ দরজা তো নিজ হাতেই খুলে দিয়েছে করবী, ঘর তছনছ হতে দিয়েছে, নিজেকে লুণ্ঠিত হতে দিয়েছে। করবী ভেবে পেল না ও কী করবে এখন।

করবী অন্যমনস্ক হয়ে এখন রোবটের মতো যান্ত্রিকভাবে যা বলার বলে, যা করার করে, যেন বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে নিজের ভেতরে ঢুকে গিয়েছে করবী। বিনোদিনীই প্রথম লক্ষ্য করলেন ব্যাপারটা, তীক্ষ্ম সন্ধানী চোখে করবীর দিকে তাকিয়ে প্র্ন করলেন একদিন, তোমার কি শরীর খারাপ, বৌমা? করবী চমকে উঠে বলল, না তো মা, শরীর ভালোই আছে। বিনোদিনী বললেন, তবে কি মন খারাপ, সায়নের সঙ্গে কিছু হয়েছে? করবী ম্লান হেসে বলল, না মা, আম ার শরীর, মন সব ঠিকই আছে। বিনোদিনী করবীর উত্তরে সন্তুষ্ট না হলেও আর কথা বাড়ালেন না।

সায়নের কাছে ধরা পড়ল কিছু দিন পর। একদিন রাত্রে শোবার ঘরে সায়ন জিজ্ঞেস করল, তোমার কি হয়েছে বলো তে া? একটু চমকে দুহাত বুকের ওপর রেখে করবী বলল, কই কিছু না তো। ও যেন দুটি অসহায় হাত দিয়ে বুকের ভেতরট াকে আড়াল করতে চাইছিল সায়নের কাছ থেকে। সায়ন কিছুক্ষণ করবীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, কাজে ব্যস্ত থ াকায় তোমাকে আমি সবসময় সঙ্গ দিয়ে উঠতে পারি না ঠিকই। অনেকদিন কোথাও যাওয়াও হয় না। পুরী যাবে? ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটোকে আশ্রয় ক'রে বাঁচার চেষ্টা করে, তেমনি ভাবে করবী আঁকড়ে ধরল সায়নের প্রস্তাব। সোৎসাহে বলল, চলো ঘুরে আসি। সায়ন বলল, ঠিক আছে, অ্যারেঞ্জ করি তা হলে।

পুরী এসে একটা হলিডে হোমে উঠল ওরা। ওদের ঘরের জানালা খুললেই হাতের কাছে সমুদ্র। ঘর মনে ধরল করবীর। ও উচ্ছ্বসিত হয়ে ডানা ঝাপটে বলল, ঘরটা কী সুন্দর! সায়ন হঠাৎ করবীর কাছে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলে ধরে বলল, কপোত কপোতী যথা উচচ বৃক্ষচূড়ে। করবী খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, ছাড়ো ছাড়ো, পড়ে যাব, ইস্ তুমি কী দস্যু!

এরপর কয়েকটা দিন ওরা কাটিয়ে দিল লঘুপক্ষ বিহঙ্গমের মতো সমুদ্রসৈকতে, কন্‌ডাকটেড ট্যুরে, শপিংয়ে আর পুরীর মন্দিরে।

কলকাতা ফের আগের রাতে ওরা বসে ছিল খাটে। করবীর পরনে ছিল নাইটি, সায়নের পাজামা আর গেঞ্জি। দু'জনে অন্তরঙ্গ গল্পগুজবে সময় কাটাচ্ছিল। সমুদ্রের দিকে জানালাটা খোলা ছিল, হাওয়া আসছিল বেশ। হঠাৎ করবী উঠে গিয়ে দাঁড়াল জানালার ধারে। সামনেই সমুদ্র। গর্জমান সমুদ্রের বিশাল ঢেউগুলি মাথায় শাদা ফেনা নিয়ে বারবার এসে আছড়ে পড়ছে জানালার কাছে, যেন ঘরে ঢুকে পড়ে লণ্ডভণ্ড করে দিতে চাইছে সব-কিছু। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পুরোনো ভয়টা জেগে উঠল করবীর মনে, যে-ভয় এড়াবার জন্য পুরী এসেছে ও। ভয়টা ক্রমশই বেড়ে উঠতে লাগল। একসময় ও আর ওদিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না। জানালাটা হঠাৎ সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে জানালায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। ঘাড়টা একটু কাত করে চোখ বুজে ঘনঘন শ্বাস নিতে লাগল। সায়ন একটু অবাক হয়ে করবীর কাছে গিয়ে ওর একটা হাত নিজের দুটো হাতের মধ্যে একটু চাপ দিয়ে বলল, কী হল? করবী আস্তে আস্তে চোখ খুলে সায়নের চোখে চোখ রাখল , ওর বুকের ওপর রাখল একটা হাত। বলল, কিছু না। সায়ন করবীর চোখের ভাষায় যে সংকেত দেখতে পেল তা ওর চেনা। ও করবীর হাত ধরে নিয়ে বসাল খাটে, বেডসুইচটা অফ্ করে দিল।

ঘরের বাইরের সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছিল করবী। ও তখন ঘরের ভেতরের সমুদ্রের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে, সে সমুদ্র বারবার আছড়ে পড়ছে করবীর তটভূমিতে, তছনছ করে দিচ্ছে ওকে। আর বাইরের সমূদ্রও যেন গর্জন করে মাঝে মাঝে ঢুকে পড়তে চাইছে ঘরে। এই দুই সমুদ্রের দ্বৈরথে আস্তে আস্তে পরাজিত হতে লাগল বাইরের সমুদ্র, জিতে যেতে লাগল ভেতরের সমুদ্র। একসময় আর বাইরের সমুদ্রের গর্জন শুনতে পেল না করবী। ভেতরের সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ে ভেসে যেতে যেতে, ডুবে যেতে যেতে করবী ভাবল জীবনে অনুতাপ নেই, দুঃখ নেই, ভয় নেই, আছে শুধু আনন্দ, অফুরন্ত উন্মাদ আনন্দ। বাইরের সমুদ্রের ভয়কে ঠেকাবার জন্য ভেতরের সমুদ্রের দেওয়া এই আনন্দই পেতে চেয়েছিল করবী।

ওরা আবার ফিরে এল কলকাতায় পুরোনো জীবনে। পরিচিত পরিবেশে, পরিচিত ঘরে। নাইট জার্নি করে ওরা ফিরেছিল সকালে, দুপুরের খাওয়া সেরে সায়ন বেরিয়ে গেল কাজে। বিনোদিনী নীচে নেমে গেল লুডো খেলতে। করবী নিজের খাটে এসে শুয়ে পড়ল একটু ঘুমাবে বলে। কিন্তু ঘুম এল না ওর। হঠাৎ মনে হল এই খাটে একদিন একজন অসহায় দুঃখী মানুষ শুয়েছিল। তারপর কাউকে কিছু না-বলে নিঃশব্দে চলে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। সে কথা মনে হতেই ওর নেমে একে একে জেগে উঠল অনুতাপ, দুঃখ, ভালোবাসা, ভয়। ওর মর্মমূলে যেন গোপন রক্তক্ষরণ শু হল। কিন্তু যে মানুষটার জন্য ওর এই হেনস্থা, সে তো আর এল না। হয়তো ভুলেই গেছে এ-বাড়ির একজনের কথা। টো-টো ঘুরছে এখানে ওখানে। কলকাতাতেই আছে কিনা কে জানে। না কি কলকাতার বাইরে গিয়েছে বেড়াতে, যে রকম ও যায় মাঝে মাঝে। হঠাৎ হয়তো একদিন উদয় হবে এসে গান শুনতে। গানের কাছে আসবে ও গায়িকার কাছে নয়। এরকম লোককে যে ভালোবাসে তার সর্বনাশ হয়ে যায়।

অথচ যার জন্য ভালোবাসা তাকে জানাবে কী করে? জানাতে পারলে হয়তো মনের ভার লাঘব হয়ে যেত। এই গুভার আর বহন করতে পারছে না করবী। হঠাৎ ভাবল সায়নের ডায়ারিতে হয়তো কৌশিকের অফিসের ফোন নম্বরটা পেয়ে যেতে পারে। ও উঠে খুঁজে বের করল সায়নের ডায়ারি। পাতা ওলটাতে ওলটাতে একসময় পেয়েও গেল নম্বরটা।

ফোনের কাছে গিয়ে ডায়াল করল করবী। ওপার থেকে সাড়া পেয়ে করবী কৌশিককে চাইলে একসময় কৌশিক এসে ফোন ধরে বলল,

---হ্যালো।

---কে, কৌশিক, আমি করবী। কী ভাগ্য অফিসে পাওয়া গেল আপনাকে।

---ভাগ্য তো অফিসেরও। বলুন, কী ব্যাপার অনেকদিন দেখা নেই।

---আপনার দিক থেকে আগ্রহ নেই, তাই দেখা নেই। তিনমাস আগে এসেছিলেন আমাদের এখানে।

---বা বা, এতদিন হয়ে গেল, আমার তো ধারণা মাসখানেক।

---কোনো ব্যাপারেই আপনার কোনো ধারণা নেই, কৌশিক।

---যাব একদিন আপনাদের বাড়ি হুট করে। আমি তো কোনো কিছু প্ল্যান ক'রে করি না।

---কিন্তু আমি প্ল্যান করে চলি। আমার প্ল্যান অনুযায়ী কাল দুপুর দুটোয় মেট্রো সিনেমার সামনে অপেক্ষা করবেন। আমি যাব।

---ঠিক আছে, যাব।

---ফোন ছেড়েই অ্যাপয়েন্টমেন্টটা একটা কাগজে লিখে রেখে দিন দিয়ে গেঁথে রাখুন জামায়। কাল ওই জামা পরেই আসবেন।

---ঠিক আছে বৌদি, কালকের অ্যাপয়েন্টমেন্টটা যাতে ফেইল না করি তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আগেও এ-ব্যাপারে অসুবিধায় ফেলেছি কয়েকজনকে।

---খুব ভালো করেছেন, ছাড়ছি।

---ছাড়ুন।

পরদিন একটায় ও খেয়ে দেয়ে বাড়ি থেকে বেরলো। কালই বাড়িতে বলে রেখেছিল ভবানীপুরে ওর এক বান্ধবীর বাড়ি যাবে দুপুরে জরি প্রয়োজনে। চিৎপুর রোডের দিকে যেতে যেতে ও ভাবল অভিসারের পথ হিসেবে চিৎপুর রোড খুব সুবিধের নয়, যে-কোনো সময় ট্রাফিক জ্যাম হতে পারে। পরক্ষণেই ভাবল অভিসারের পথ তো চিরকাল দুর্গম। এখন তা তবু যানবাহন আছে, শ্রীরাধিকার তো পায়ে হেঁটেই যেতে হত। চিৎপুর রোড থেকে ও একটা ট্যাক্সি নিল। ট্যাক্সিতে যেতে যেতে ও ভাবল কুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণের দেখা পাবে কি না। না কি উনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ভুলে কোনো চন্দ্রাবলীর কাছে চলে গিয়েছেন হুট করে।

ট্যাক্সিতে যেতে যেতে একটা অস্পষ্ট ভয় জেগে উঠল করবীর মনে। যতই ও এগিয়ে যেতে লাগল এসপ্ল্যানেডের দিকে, ততই যেন মনে মনে এসপ্ল্যানেড থেকে পিছিয়ে পড়তে লাগল। একসময় ওর মনে হল ট্যাক্সিটা এগিয়ে যাচ্ছে একটা অনিশ্চিত গহ্বরেরদিকে। হঠাৎ ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল সায়নের দরাজ বুক, যেখানে মাথা পেতে ও পেতে পারে একটা নিশ্চিন্ত, নির্ভার আশ্রয়। দু'দিকের টানের মধ্যে পড়ে কিছুক্ষণ ছটফট করার পর অনুভব করল করবী পেছনের টানটাই যেন ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠছে। একসময় মাধ্যাকর্ষণই জয়ী হল। অনেক দিন পর ও আবার ফিরে এল পৃথিবীর নিশ্চিত মাটিতে। হঠাৎ ড্রাইভারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে উঠল করবী, ভবানীপুর চলো।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com